প্রথম অধ্যায় :

জীবনী

(ক) ব্যক্তিজীবন

রাধারাণী দেবীর জন্ম কোচবিহারে ১৯০৩ সালের ৩০শে নভেম্বর বাংলা ১৩১১ সনে ১৪ই অগ্রহায়ণ। সেদিনটি ছিল শুক্লাচতুর্দশী। পিতা মাতার চোদ্দটির সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন একাদশ। পিতা স্বর্গীয় আশুতোষ ঘোষ তৎকালীন স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের শাসন বিভাগের ম্যজিস্ট্রেট ছিলেন। পিতামহ পঞ্চানন ঘোষ দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামের জমিদার ছিলেন। পরে তিনি বেনিয়ান বা ইংরেজ সরকারের ব্যবসা বিভাগের এজেন্ট হন। মূলতঃ শহর কোলকাতার বনেদী ও বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির মধ্যে ঘোষ পরিবার ছিল অন্যতম। কোলকাতার বাদুড়বাগান অঞ্চলের এই পরিবারের বসবাস ছিল। সেকালের খ্যাতনামা একজন মুৎসুদ্দি পঞ্চানন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ও সফল মানুষ ছিলেন। তাঁর নামে রাস্তা অর্থাৎ উত্তর কলকাতার বাদুড়বাগান অঞ্চলের পঞ্চানন ঘোষ লেন আজও তার সাক্ষ্য বহন করে। পিতা আশুতোষ ঘোষ (জন্ম আনুমানিক ১৮৬২) শিক্ষান্তে কোচবিহার রাজ্যের শাসন বিভাগের কাজে যোগদান করেন ও পরবর্তী কালে ম্যাজিস্ট্রেট হন। পিতৃদেব আশুতোষ ঘোষ ছিলেন কেশবচন্দ্রের অনুগামী। রবীন্দ্রসাহিত্যেও তাঁর ছিল আন্তরিক

অনুরাগ। প্রাত্যহিক জীবনে তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ ও বেশ রাশভারি লোক। কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে পারিবারের অঅবহটি ছিল স্বচ্ছসুন্দর ধর্মনিষ্ঠ ও সাহিত্য প্রেমময়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি জেলা কোচবিহার তখন দেশীয় রাজ্যের অধীন ছিল। কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে দিনহাটা শহরে রাধারাণী দেবীর জন্ম হয়। পিতা মাতার চোদ্দ সন্তানের মধ্যে একাদশ সন্তান রাধারাণী। রাধারাণী দেবীর মাতা নারায়ণী দেবী উত্তর কলকাতার বিখ্যাত হাটখোলার দত্ত পরিবারের কন্যা ছিলেন।

জন্ম থেকে শুরু করে কৈশোর পর্য্যন্ত কোচবিহারের উন্মুক্ত ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় আবেষ্টনের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছিলেন রাধারাণী। সেখানেই তাঁর পাঠ্য জীবন ও সাহিত্য জীবন শুরু হয়। পিতা আশুতোষ ঘোষ ছিলেন সংস্কৃতি মনা ও সাহিত্য অনুরাগী। তখনকার শিশুপাঠ্য পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকাগুলি তাঁর বাড়িতে নিয়মিত আসত। পিতার শিক্ষানুরাগ সাহিত্য প্রিয়তা ও রবীন্দ্রানুরাগ কন্যা রাধারাণীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। সেই যুগে ও সেই সময়ে মানুষের জীবনে এত ব্যস্ততা ছিল না। পারিবারিক বন্ধনও ছিল অনেক অকৃত্রিম ও ব্যাপক। গ্রামীণ সারল্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে অখণ্ড অবসরভোগী মানুষ সাহিত্যের রূপ ও রস খুঁজে পায় এই ইতিবাচক পরিবেশের মধ্যে মনের ব্যপকতা স্ফূটনের যে অনাবিল সুযোগ আছে তাতে সন্দেহ নেই। রাধারাণী

দেবীর সাহিত্য অনুরাগ বর্ধিত হয় বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। দিনহাটার ছবিরুন্নিসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর শিক্ষানুরাগকে তৃপ্ত রাখতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে নিজ গৃহে স্বশিক্ষায় — সংস্কৃত, ইংরাজি ও ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁরই মেজদার হাতে লেখা পত্রিকা 'সুপথে'। প্রায় একই সময়ে 'মানসী ও মর্মবাণী' সাময়িক পত্রে তাঁর কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতার নাম 'দেবতা' প্রকাশকাল — মাঘ ১৩২২।

১৩২৪ সালে (১৯১৬) মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। * স্বামীর নাম সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত দত্ত বংশের সন্তান উচ্চ শিক্ষিত; পেশায় কৃতী ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার। মধ্য ভারতের একটি স্বাধীন রাজ্য রামপুর স্টেটে তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাত্র ৮ দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসে বিবাহান্তে বালিকা বধূকে কলকাতায় রেখেই তিনি তাঁর কর্মস্থানে ফিরে যান। নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ মাস তিনেকের মধ্যেই সুদূর প্রবাসে সামান্য এশিয়াটিক 'ফ্লু' রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। ১৩ বছর বয়সে রাধারাণীর বৈধব্য জীবনের শুরু। প্রাথমিক পর্বে

---

* *এই বিবাহে তার ঘোর আপত্তি ছিল। পাঠপ্রিয় রাধারাণী এই বিবাহ করতে চাননি কিন্তু সামাজিক রীতি অনুসারে তাঁর বিয়ে হয়।*

ব্যথিতচিত্ত বালিকাবধূর জীবনটা তার পিতৃগৃহে কেমন কেটেছিল — তার এক করুণ বিবরণ পাই কবিকন্যা নবনীতার লেখায়:

'তেরো বছর বয়সে বিধবা হওয়া রাধারাণী দত্তের স্বামীরও ওই এশিয়াটিক ফ্লু-তে মৃত্যু ঘটেছিল। বই-পাগল রাধারাণী তাঁর মায়ের চোখে কোনকালে প্রিয় ছিলেন না। বৈধব্যের কঠোর নিয়মকানুন জোর করে সধবা মা-ই পালন করিয়েছিলেন বালিকা কন্যাকে। একাদশীর দিন স্নানের সময়ে রাধারাণীর সঙ্গে স্নানঘরে একটি দাসী, কিংবা কোনো দিদিকে পাহারায় পাঠাতেন — বিধবা মেয়েটি যাতে লুকিয়ে স্নানের জল পান করে পাপকর্ম না-করে ফেলে। একাদশীর উপবাসটি নির্জলা হওয়া চাই তো? রাধারাণীর দীর্ঘ চুল কেটে ফেলে, তাকে নিরলংকার করে, থান পরানো বাপের বাড়িতেই হয়েছিল।''[১]

মামাশ্বশুর সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের কাছে রাধারাণী দেবী নিজ স্বভাবগুণে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত এই বালিকা বধূর প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম সহানুভুতি ছিল। এই অকৃত্রিম সহানুভুতির বড় প্রীতিস্নিগ্ধ উল্লেখ পাই কবিকন্যার রচনায়:

'শ্বশুরগৃহে গিয়ে রাধারাণীর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। অন্য একটি নতুন ভূমিকা হলো তাঁর। সেখানে বালিকাটির প্রতি

NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY
166009
28 FEB 2004

সকলেরই অসীম মমতা। তার লেখার জন্যে টেবিলচেয়ার খাতাকলম এলো। শ্বশ্রূমাতার নির্দেশে চুলগুলি সযত্নে আবার বড় করা হলো, থানধুতি ছাড়িয়ে লালপেড়ে শাড়ি পরানো হলো। নির্জলা উপবাস বন্ধ করা হলো। হাতে গলায় কানে সামান্য সোনা উঠলো। তার শূন্যতা ভরাতে চেয়ে সংসারের সব ব্যাপারেই রাধারাণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক, অনিবার্য করে তুললেন তাঁর শ্বশুরবাড়ির মানুষরা। এমনকি সংসারের আর্থিক হিসাবরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে 'বাড়ির বড় ছেলে'র সম্মানটুকু দেওয়া হলো তার বিধবা বৌটিকে।[২]

মামাশ্বশুর সুরেন্দ্র নাথ মল্লিককে লেখা একটি চিঠির উল্লেখ করলে এ কথাটি পরিস্কার হবে —

শ্রীচরণ কমলেষু

বড় মামাবাবু আপনি কেমন আছেন? আপনি ও মামীমা আমার "বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। আপনার শরীর পূর্বাপেক্ষা একটু সারিয়াছে কিনা জানাইবেন। আপনি কবে কলিকাতায় আসিতেছেন? হাজারিবাগে এখন শীত কেমন?

মামাবাবু! তিনি স্বর্গে ভগবানের নিকট গিয়াছেন ও বেশ

সুখে আছেন। আপনারা কাঁদিবেন না। মামীমাকেও তাঁহার জন্য কাঁদিতে বারণ করিবেন। কাঁদিলেও আর ফিরিয়া আসিবেন না। আমরা কাঁদিতেছি দেখিলে তাঁহার মনে কষ্ট হইতে পারে। তিনি এখন তাঁর বাবা, দাদাবাবু সবাইকে দেখিতে পাইতেছেন ও ভগবানের কোলে খুব সুখে আছেন। ছোট মামাবাবু বলিয়াছেন যে আমরা সকলেই একদিন তাঁহার নিকট যাইব। তখনতো আর তিনি আমাদের ছাড়িয়া পলাইতে পারিবেন না। সে ভারি মজা হইবে। আর বড় মামাবাবু! ছোট মামাবাবু বলিয়াছেন যে আমি না কাঁদিলে আমাকে যেমন জামাইবাবু রামপুরে আনিয়াছিলেন তেমনি ছোট মামাবাবু তাঁর কাছে দিয়া আসিবেন। আমাকেও ঐ রকম লাল কাপড় ঢাকা দিয়া ভগবানের কাছে ছোটমামাবাবু দিয়া আসিবেন। সে ভারি মজার কথা না মামাবাবু?

আমার কিন্তু মোটে আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। শীঘ্রই তাঁর কাছে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বড় মামাবাবু, আর একটি কথা আপনাকে শুনিতেই হইবে। আপনি এখন স্বর্গে পলাইয়া যাইবেন না। ছোট মামাবাবু বলিয়াছেন আমাকে স্বর্গে তাঁর কাছে পাঠাইয়া তবে যাইবেন। মামাবাবু! আপনিও তাই করিবেন। আমাকে ফেলিয়া আগে স্বর্গে যাইবেন না। আমি বাবাকে

জামাইবাবুকে মাকে সবাইকে বারণ করিয়াছি। আর মামাবাবু! আমি আপনাদের মনে কষ্ট হবে, বাবা মার মনে কষ্ট হবে বলে ছোট মামাবাবুর কথা মত আবার চুড়ি পরিয়াছি, বিছানায় শুই, বামুন ঠাকুরের রান্না খাই! ওসব করিলে আপনাদের মনে কষ্ট হবে কিনা।

আমি আর কারও মনে কষ্ট দিব না, তাহলে ভগবান আবার এই রকম কষ্ট দিবেন। আমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে হব তবে তাঁর কাছে যেতে পারব। আমাকে ছোট মামাবাবু আগের চেয়েও খুব বেশিই ভালবাসেন। কলিকাতার সেই বাবার মতই আর ভাল কথা শিখান, আমার খুব ভাল লাগে। আর বড় মামাবাবু! আপনিতো একজন বড় মামাবাবু! আবার এখানে আর একজন বড় মামাবাবু ও মামীমা হয়েছেন, তাঁরাও আমাকে খুব ভালবাসেন। আর সকলেই বলেছেন আমার ছেলেমেয়ে হবেন। আপনিও। ছোট মামাবাবু বলেন আমি সবাইকার মা হয়েছি।

আপনারা দুঃখ করবেন না। দুঃখ করে কি হবে? তিনি ত ভাল আছেন। আপনি ভগবানকে বলবেন তাঁকে খুব সুখে রাখেন। এখানে সবাই ভাল আছেন। আমাকে মাঝে চিঠি লিখবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের মেয়ে

বউমা[৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কবিকন্যা প্রখ্যাত কবি ও কাহিমীকার, অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেন এই চিঠিটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে — এই চিঠিটি থেকেই রাধারাণী দেবীর "...গল্প-প্রবন্ধগুলির পটভূমি বোঝা কিছুটা সহজ হয়ে যাবে।"[৫]

চিঠিতে দুর্ভাগিনী বালিকা বধূটির শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিকাঠামো ও রীতিনাতির মর্মান্তিকতা পাঠকের চিত্তকে ব্যথিত করে। মৃত্যুর বাস্তবতা সম্পর্কে শিশুসুলভ অজ্ঞতার পাশাপাশি তাকে যে চুড়ি পরানো হচ্ছে প্রথা ভেঙ্গে বিছানায় শোয়ান ও ঠাকুরের হাতে রান্না গ্রহণ করান হয়েছে এই খবরটিও পাই এবং এর সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে যায় মেয়েটির মনের সাংসারিক গুরুত্ব ও পরিতৃপ্তি ও মনগড়া মাতৃত্ব লাভের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি। এই চিঠির বছর পাঁচেকের মধ্যেই পরিণত মনস্কা রাধারাণী পত্র পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন।

'বাল্য-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে প্রতিকূল দৈবের এই নির্মম আঘাত বুকে নিয়ে রাধারাণী সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পুনর্বিবাহের জন্য পিতামাতা ও অগ্রজগণের ত্রুটি ছিল না। শ্বশুর পরিবারও এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা বলিকা-বধুর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য

আন্তরিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু পুনর্বিবাহের প্রতি কবি-কিশোরী কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করেননি। রবির আলোর তার চিৎকমল বিকশিত হয়েছিল। বাগ্‌দেবীর আরাধনাই হল তাঁর জীবনের ব্রত। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে, ১৩৩০ সাল থেকেই ভারতী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণীতে তরুণী কবি রাধারাণী দত্তর কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল।'[৬]

তাঁর চিন্তায়, কলমের ভাষায় ক্রমশই আশ্চর্য ও তীক্ষ্ণ পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তীক্ষ্ণতা ও পরিণতিবোধ পুরানো মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়নি। সেইসময়কার গল্পে কবিতা ও প্রবন্ধে পুরানো মূল্যবোধের চিহ্ন থেকে গেছে। 'লীলাকমল' কাব্যগ্রন্থে দয়িতের প্রতি প্রেম আকাঙ্ক্ষায় এবং বিরহের বেদনায় সেই মনোভাব অতি সুস্পষ্ট। 'সাবিত্রীচরিত্রের' মধ্যেও (শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে) সেই জীবনের ছবিটি খুঁজে পাই।

বালিকা বয়সেই পতি হারানোর সুতীব্র বেদনা আর সেই সঙ্গে মাতৃত্বের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ — সমগ্র বিষয়টিকে বড় মরমী আন্তরিকতায় কবি কন্যা নবনীতা বড় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

'(রাধারাণী দেবীর) গল্প ও প্রবন্ধ থেকে আরও বুঝতে পারি, যে এই মহিমাময়ী, আত্মত্যাগী, দুঃখিনী মেয়েটিকে খোলসের

মতো পরিত্যাগ করে তার ভস্মাবশেষ থেকে পুনর্জাত হয়েছিল দ্বিতীয় জন্মের রাধারাণী দেবী। যার পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যেও মহত্ত্বের, নিঃস্বার্থতার, স্নেহ-মমতার অভাব দেখিনি। কিন্তু এই সব প্রবন্ধ পড়বার পরে বুঝতে পারছি মাতৃত্ব তাঁর কাছে আকৈশোর কতটা জরুরি ছিল। বালিকা রাধারাণীর মধ্যে বালবিধবা জীবনের প্রধান ব্যর্থতা, এই বাধ্যকরী বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ। হয়তো দ্বিতীয় বিবাহটির জন্য অনেকখানি দুঃসাহস তাঁকে জুগিয়েছিল সেই মাতৃত্ব অর্জনের স্বপ্নই।' ...[১]

'কিন্তু পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত ও চর্চিত সাহিত্যানুরাগ এই দুঃখিনী বাল বিধবাকে যেন মায়ের মতই কোল দিল। সকল বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করে তিনি অতঃপর সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করলেন। এই বালবিধবার পুনর্বিবাহের জন্য একদিকে যেমন তাঁর পিতামাতা ও অগ্রজেরা আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন, তেমনি তাঁর শ্বশুরবাড়ির দকি থেকেও সে বিষয়ে উৎসাহের অভাব ছিল না। কিন্তু রাধারাণী, সেই বালিকা কবি কিন্তু তখন এই পুনর্বিবাহে আদৌ উৎসাহী হন নি। সহজ স্বাভাবিকতায় তিনি সাহিত্যসেবায় ব্রতী হলেন। মাত্র কয়েকটি বছরের আন্তরিক ও সুনিবিড় প্রস্তুতি। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ থেকেই তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত সাময়িকপত্র সমূহে, ভারতী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতার প্রায় নিয়মিত প্রকাশ শুরু হল।

"এই কাব্য-প্রকাশের সুত্রেই কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারাণী দত্ত-র অন্তরঙ্গতা ঘটে। নরেন্দ্র দেব ঠনঠনিয়ার দেব-বংশের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন নবাব আলিবার্দী খাঁ-র দেওয়ান। নরেন্দ্র দেবের জন্ম ১৮৮৮ সালে। সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতী গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যেই তাঁর যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। 'কল্লোল' যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে। কবি ও কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর শক্তি সাহিত্যিক-সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে।

নরেন্দ্র দেব ছিলেন রাধারাণী দত্তর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। বয়সে পনের বছরের বড়ো। ভাগ্য-বিড়ম্বিতা এই প্রতিভাশালিনী আত্মীয়াটিকে সহিত্যক্ষেত্রে সর্বভাবে উৎসাহিত করা ছিল তাঁর স্নেহকৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কল্লোল-কালিকলমে উভয়েরই লেখা প্রকাশিত হতে লাগল — প্রেমের কবিতা ও গল্প। আত্মীয়তা সত্ত্বেও উভয়ের অন্তরঙ্গতা পরিজন-মহলে বিরূপ সমালোচনা সৃষ্টি করল। রাধারাণী দুরন্ত হাঁপানি রোগে প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। তাঁর যথাযথ শুশ্রূষার অসুবিধা ঘটতে লাগল। সামাজিক কলগুঞ্জনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য নরেন্দ্র দেব

বিবাহের প্রস্তাব করলেন। সম্পর্কের দিক দিয়ে শাস্ত্রসম্মত বিবাহে সামাজিক কোন বাধা ছিল না। কিন্তু দেব-পরিবার সম্বন্ধে রাধারাণীর পিতা আশুতোষ ভালো ধারণা পোষণ করতেন না। বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি পাওয়া গেল না। বাইরের প্রতিকূলতায় রাধারাণী নিজের অন্তরের দিকে ফিরে তাকালেন। শ্রদ্ধায়-কৃতজ্ঞতায়, সাহিত্যিক সমপ্রাণতায় তিলে-তিলে যে পরম অনুরক্তি গড়ে উঠেছে তার নির্দেশই তিনি মেনে নিলেন। ১৯৩১ সালের একত্রিশে মে দুই কবি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বিবাহের সময় নরেন্দ্র দেবের বয়স তেতাল্লিশ; রাধারাণীর আটাশ। বাংলার সারস্বত সমাজ এই বিবাহকে স্বাগত জানাল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র দেব দম্পতিকে আশীর্বাদে অভিনন্দিত করলেন। বিবাহের এক বছর পরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হল। শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তৃতীয় দিনেই সে মায়ের কোল শূণ্য করে চলে যায়। কয়েক বছর পরে কবি-দম্পতি একটি কন্যারত্ন লাভ করেন — কবিগুরুই তার নামকরণ করেন, নবনীতা।[৯]

নরেন্দ্র দেব তাঁর যথার্থ সাহিত্য-সাথী ছিলেন। নরেন্দ্র দেবের একক সম্পাদনায় সুবিপুল সাহিত্য কাব্য গ্রন্থ 'কাব্য-দীপালি' প্রকাশিত হয়। এই সংগ্রেহের

সম্পাদনা ও সংকলনের নরেন্দ্র দেবকে রাধারাণী দেবী সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ১৯৩১ সালের ৩১শে মে কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। বাংলা ১৭ই জৈষ্ঠ্য ১৩৩৮। তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজে * এই বিবাহ বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। কাব্য সাধনার সূত্রে একজন যশশ্বিনী মহিলা কবির সঙ্গে আর এক সতীর্থ কবির বিবাহ একটি অনন্যপূর্ব ঘটনা। এই বিবাহে রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের বিশেষ সমর্থন ছিল। তারা কবি দম্পতিকে আন্তরিক আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে বিশেষ তারবার্তায় বিবাহে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তৎকালীন প্রায় সমস্ত পত্র পত্রিকায় এই বিবাহ সংবাদ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। লিলুয়ায় অনুষ্ঠিত হয় এই বিবাহ অনুষ্ঠান হিন্দু বিবাহ রীতি অনুসারে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন খ্যাতনামা সম্পাদক লেখক শ্রী জলধর সেন। ** এই বিবাহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কন্যার আত্মসম্প্রদান। এই বিবাহ সভায় যোগদান করেন শ্রী ও শ্রীমতী পি. চৌধুরী, শ্রী ও শ্রীমতী সুন্দরীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রী ও শ্রীমতী চারু রায়, শ্রী ও শ্রীমতী প্রেমাঙ্কুর আতথী, শ্রী ও শ্রীমতী গিরিজারঞ্জন বসু, শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রী নলিনীরঞ্জন সরকার, কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী, সুবোধ রায় ও জলধর সেন। লিলুয়ার দেব পরিবারে প্রাসাদোপম 'দেবালয়ে' নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী বিবাহের পরবর্তী কয়েকটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন।

কবি নরেন্দ্র দেবের জন্ম ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সম্মুখস্থ ১ নং রমেন্দ্র দেব রোডের বনেদী দেব বংশে। তাদের পূর্ব পুরুষ নবাব আলীবার্দী খাঁর দেওয়ান ছিলেন। নবাবী খেতাব ছিল সরকার। নরেন্দ্র দেব সুপরিচিত সাহিত্যিক, বসুধারা ও ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মেঘদূত ও ওমর খৈয়ামের কবিতাগুলির অনুবাদক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সদা হাস্যময়, সুরসিক নরেন্দ্র দেব দেব সাহিত্য কুটিরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে দেবদম্পতির কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ সাদর আশীর্বাদ সহ নাম দিলেন নবনীতা।

শৈশবের প্রকৃতি — তাঁর স্মৃতিকথায় কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার একটি লেখাতে তা প্রকাশ পেয়েছে।

"আমার ছেলেবেলা, কৈশোর কেটেছে উত্তরবঙ্গে। চারদিকে নদী মাঝখানে একটা দ্বীপ যেন, সেখানে আমরা থাকতাম। জায়গার নাম মাথাভাঙ্গা। বাবা ছিলেন জেলার হাকিম। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি গ্রামের হাটে দুর্গা ঠাকুর। মাটির প্রতিমা, এক চালার। পেছনে সুন্দর চালচিত্র। ধূপধূনোয় দেবীমূর্ত্তির চেহারাই যেত বদলে। ঢাকি, ঢাকের বাদ্যি, পুরোহিত, তন্ত্রধারকদের গমগমে গলায় মন্ত্রপাঠ সব মিলিয়ে দারুণ। সবাই

নতুন জমাকাপড় পড়ত, আমরাও। কলকাতা থেকে পার্শেলে শাড়ি আসত আমাদের। ডুড়ে পার, রঙীন সুতোয় বোনা শান্তিপুরী। কলকাতা থেকে আত্মীয়রা পাঠাতেন। একখানি করেই শাড়ি হত আমাদের, তা নিয়েই কত আনন্দ। চারদিন ধরে সেই শাড়ি পড়েই ঘোরা। আবার বাড়ী এসে সেটাকে সুন্দর পাট করে গুছিয়ে রাখা। আরও ছেলেবেলায় আসত পাছাপেড়ে শাড়ি। ভাইদের জন্য নতুন ধুতি। আর আসত কলকাতা থেকে নতুন জুতো। পায়ের মাপ-ছাপ তুলে পাঠান হোত। তারপর পার্শেলে চলে আসত জুতো। সারা বছর আমরা অবশ্য আশপাশের দিশি মুচিদের তৈরী জুতো কিনতাম। এমনি সময়, আর পুজোতে মা খুব চওড়া পাড় সাদা শাড়ি পরতেন।...

...তখন, সেইসব পূজোর দিনে আমরা খুশী থাকতাম একটা শাড়ীতে, অথচ এ যুগে দেখি জামার ওপর জামা, শাড়ীর ওপর শাড়ী, পোষাকেও ওপর পোষাক অথচ কারুর মুখে সেই হাসির ঝলক নেই, যা আমরা দেখেছি ছোটবেলায়। আমাদের বাল্যবয়সে বাড়ীর কাজের লোকেদেরও কোন জিনিষ দিলে তারা কত খুশী হত। এখন সব একেবারে বদলে গেছে। — ('পূজোর

স্মৃতি' রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন - ১, পৃঃ ২৮৯)[৯]

১৯৪৮ সালে W.B. PEN এর যুগ্ম সম্পাদক রূপে নরেন্দ্র নাথ দেব ও রাধারাণী দেবী মনোনীত হলেন। ১৯৫০-এ PEN এর কনফারেন্সে স্বামী স্ত্রী দুজনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে ইওরোপ যাত্রা করেন। বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে প্রায় ছ মাস পরে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। এই সফরকালে কন্যা নবনীতাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব্ব ইওরোপ ও সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ফিনল্যাণ্ডের পীস কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী যাত্রা করেন একই বৎসরে। ঐ সময়ে বিখ্যাত বিপ্লবী হো-চি-মিন, বিশ্ববিখ্যাত রহস্য লেখিকা আগাথা ক্রিস্টি, মিখাইল মালোকভ, ইলিয়া এলেনবুর্গ প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে কন্যা নবনীতা উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে ১৯৬০ সালে নবনীতার বিবাহ হয়। ১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল কবি নরেন্দ্র দেব দেহত্যাগ করেন। রাধারাণী পুনরায় বিধবা হলেন। কবিকন্যা নবনীতা দেবসেন লিখছেন:

'জীবনের শেষ পনেরো বছর তিনি প্রায় ঘরের বাইরে বের

হননি — ১৯৭৫-৭৬ - এ শরৎ শতবার্ষিকীর — ঐ একটা

বছরে মা যেন নতুন করে জেগে উঠেছিলেন। তারপরে একেবারেই অন্তরীণ জীবন। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মা স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী থাকতে পছন্দ করতেন। সভাসমিতি কোনকালেই তাঁর মনের মতো ছিল না, বাবা ছিলেন সভাসুন্দর স্বভাবের মানুষ। কিন্তু শরৎ শতবর্ষে মায়ের নানা জায়গা থেকে ডাক এসেছিল, তিনি সানন্দে সেই ডাকে সাড়াও দিয়েছিলেন।

১৯৭৫ বছরটা বিশ্বের নারীবর্ষ ছিল, মা তাতে উদ্বুদ্ধ বোধ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র বিষয়ে এবং নারীমুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন সভাসমিতিতে মূল্যবান বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন সেই বছর ১৯৭৫-৭৬ - এ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ছোট বড়শহরে বক্তৃতা দিয়েছেন — লক্ষ্ণৌ কানপুর থেকে কোচবিহারে, রায়গঞ্জে।"[১০]

১৯৭৫ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালায় বক্তৃতা দেন। ১৯৭৬ সালে ধারাবাহিক ভাবে 'দেশ' পত্রিকায় 'শরৎচন্দ্র — মানুষ ও শিল্প' লিখতে থাকেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর ৮০ বছর পূর্ণ হলে বিশেষ জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁর 'ভালোবাসা' বাড়ীতে বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী জনের সমাবেশ ঘটে। ১৯৮৬ সালে রাধারাণী দেবী 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' ভূষিত হলেন। ১৯৮৮ সালে বালিগঞ্জের ''ভালো-বাসা'' বাড়িতে নরেন্দ্র দেবের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করা হয়।

রাধারাণীর সানন্দ উপস্থিতিতে সে অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত হোয়েছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে, ৮৬ বছর বয়সে রাধারাণীর তিরোধান ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি কন্যা নবনীতা, দুই দৌহিত্রী অন্তরা ও নন্দনাকে রেখে গিয়েছেন। অধ্যাপিকা নবনীতাও বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত নাম।

মায়ের রচনার প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধায় আর গভীর মমতায় বিদুষী কন্যা নবনীতা বলেন:

'নিজের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে যদি তাকিয়ে দেখি রচনাগুলির দিকে — কী দেখি? কাকে দেখি? মাকে নয়। আমার মা রাধারাণী দেবীকে আমি দেখেছি সাম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে। যশস্বী, প্রিয়মাণ স্বামী, ও অনুগত সন্তান-সমেত সচারু একটি সংসার-জীবনে সম্পূর্ণ, আপন মননশীলতার গুণে সুখীমণ্ডলে সম্মানিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রতিটি কথার মূল্য আছে, যাঁর প্রতিটি পদ-চয়নে আত্মবিশ্বাস ঝল্‌সে ওঠে।

এই রচনাবলীর ভূমিকা লিখতে গিয়ে যে তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, এখনও আমার পক্ষে আমার মা রাধারাণী দেবীর সঙ্গে তাঁকে মেলাতে পারা শক্ত, যদিও তাঁর জীবনস্মৃতির

সঙ্গে এই মেয়েটির গল্পের চরিত্রগুলির অসামান্যরকম মিল রয়েছে। গল্প এবং প্রবন্ধগুলি থেকে আরও বুঝতে পারি যে, এই মহিমাময়ী, আত্মত্যাগী দুঃখিনী মেয়েটিকে খোলসের মতো পরিত্যাগ করে তার ভস্মাবশেষ থেকে পুনর্জাত হয়েছিলেন দ্বিতীয় প্রজন্মের রাধারাণী দেবী। যাঁর পরিপুর্ণ জীবনের মধ্যেও মহত্ত্বের, নিঃস্বার্থতার, স্নেহমমতার অভাব দেখিনি। কিন্তু এইসব প্রবন্ধ পড়ার পরে বুঝতে পারছি মাতৃত্ব তাঁর কাছে আকৈশোর কতটা জরুরি ছিল। বালিকা রাধারাণীর মনে বালবিধবা জীবনের প্রধান ব্যর্থতা, এই বাধ্যকরী বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ। হয়তো দ্বিতীয় বিবাহটির জন্য অনেকখানি দুঃসাহস তাকে জুগিয়েছিল এই মাতৃত্ব অর্জনের স্বপ্নই। এবং দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি, মা হবার পর থেকেই রাধারাণী দেবীর কলম ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে আসে। অভাব কিসের ছিল, সময়ের, না অন্তরের তাগিদের, আমাদের এখন তা আর জানবার উপায় নেই।''[১১]

(খ) সাহিত্য জীবন

অতি বাল্যকাল থেকেই রাধারাণী সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনার বিকাশ ঘটে মেজদার হাতে লেখা পারিবারিক পত্রিকা 'সুপথে'।

প্রায় একই সময়ে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সাময়িক পত্রে তাঁর একাধিক কবিতাও প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ থেকে রাধারাণী দেবীর রচনা ভারতবর্ষ, বসুমতী, 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', কল্লোল, উত্তরা, প্রবাসী, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। এ সময়ে তিনি রাধারাণী দত্ত নামে লিখতেন। ১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লীলাকমল' প্রকাশিত হয়। মানব হৃদয়ের চির তৃষ্ণাতুর মনোভাব প্রকাশের খণ্ডকাব্য এই 'লীলাকমল'। প্রসঙ্গত অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য কথিত ও বিশ্লেষিত স মজাতীয় পাশ্চাত্য এক কবিদম্পতির কথাও উল্লেখযোগ্য :

'বাংলার সহৃদয় কাব্যরসিক-সমাজে দেবদম্পতিকে বাংলার ব্রাউনিঙ-দম্পতি বলে সম্মানিত করেছেন। ইংরেজ সমাজে ব্রাউনিঙ দম্পতির প্রেমনিষ্ঠা সকলেরই শ্রদ্ধার বস্তু। বাংলার কবি-দম্পতিও তাঁদের চারুশীলিত জীবনচর্যায় বিদগ্ধ রসিক সমাজের ভালোবাসা অর্জন করেছেন। তা ছাড়া রবার্ট ব্রাউনিঙ্ (১৮২২-১৮৮৯) এবং এলিজাবেথ ব্যারেটের (১৮০৬-১৮৬১) সঙ্গে বাংলার কবি দম্পতির জীবনের যেন আরও কিছু সাদৃশ্য আছে। এলিজাবেথ ব্যারেট অবশ্য রবার্ট থেকে বয়সে ছ-বছরের বড়ো ছিলেন। সেক্ষেত্রে রাধারাণী নরেন্দ্র দেবের পনেরো বছরের ছোটো। উভয় ক্ষেত্রেই হৃদয়ের আকর্ষণ গড়ে উঠেছে সাহিত্য-

জীবনের সমপ্রাণতা থেকে। রবার্ট তেত্রিশ বছর বয়সে ইতালি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এলিজাবেথের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৪৫ সালের একুশে মে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হয়। রবার্ট ও এলিজাবেথের এই প্রেমকে 'one of the most romantic literary love stories' বলা হয়ে থাকে। এলিজাবেথ বয়সে শুধু ব্রাউনিঙের থেকে বড়োই ছিলেন না, ছেলেবেলায় মেরুদণ্ডে আঘাত লাগায় তিনি চলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং সারা জীবন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়েই কাটাচ্ছিলেন। তাঁর গতিবিধি বিছানা থেকে সোফার মধ্যেই গন্ডীবদ্ধ ছিল। এই শারীরিক অক্ষমতা নিয়েই এলিজাবেথ কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। রবার্ট তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁকে ভালবেসে ফেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এলিজাবেথের পিতার কাছে তাঁর কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন। পিতা এডওয়ার্ড ছিলেন অত্যন্ত একগুঁয়ে জেদি পুরুষ। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পঙ্গু এলিজাবেথ আজীবন কুমারীই থাকেন। কাজেই তিনি বিবাহের প্রস্তাবে বিরক্ত হলেন। তাঁগ সম্মতি পাওয়া গেল না। এলিজাবেথ রবার্টকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর অনুরাগ গোপন করেই

রাখতেন। অবশেষে রবার্টেরই জয় হল। প্রথম সাক্ষাতের ষোলমাস পরে উভয়ে গোপনে পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এডওয়ার্ড কন্যার এই গোপন বিবাহের কথা কিছুই জানতে পারলেন না। বিবাহের এক সপ্তাহে পরে এলিজাবেথ নীরবে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে গেলেন। সে-গৃহে তিনি আর আর কোনোদিনই ফিরে আসেননি। রবার্ট এলিজাবেথকে নিয়ে চলে গেলেন প্রেমের দেশ ইতালিতে। সেখানেই তাঁদের মিলিত জীবনের আনন্দময় বাকি দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। ইতালির আলো-হাওয়ায় এলিজাবেথ কিন্তু অনেকটা সেরে উঠেছিলেন। দু-বছর পরে পাঁচ মাইল ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারতেন। বিবাহের তিন বছর পরে কবি-দম্পতির একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিবাহের সময় এলিজাবেথের বয়স ছিলচল্লিশ বছর। তাঁদের দাম্পত্য-জীবন পনেরো বছরের। ১৮৬১ সালে এলিজাবেথ যখন শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তাঁর বয়স ছাপান্ন, রবার্ট সবে পঞ্চাশে পড়েছেন। পত্নীর মৃত্যুর পরে তিনি ইতালি পরিত্যাগ করে ব্রিটেনে ফিরে আসেন। জীবনের বাকী আটাশ বছর বিপত্নীক কবি প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমের স্মৃতিকেই অন্তরে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। প্রেমের কবি হিসাবে ব্রাউনিং

ইংরেজি সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

পঙ্গু এলিজাবেথ যেমন রবার্টের প্রেমের স্পর্শে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছিলেন, রাধারানী দেবীও তেমনি প্রেমের স্পর্শে শুধু দুরারোগ্য হাঁপানির প্রকোপ থেকেই নিষ্কৃতি পাননি, অভিশপ্ত জীবনের বন্দীদশা থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রেমই 'লীলাকমল'-এর কবির জন্ম দিয়েছে।' [১২]

এরপর প্রকাশিত হল অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত ১৩টি কবিতা সমৃদ্ধ 'বুকের বীণা'। এই কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্য জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হল। ১৯৩০। তৎকালীন সমস্ত সাময়িক পত্রে খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকগণ এই ব্যতিক্রমী কবিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বলা যেতে পারে অপরাজিতা ছদ্মনামের আড়ালে কবির আসল পরিচয়ের সন্ধানে তাঁরা দীর্ঘকাল সচেষ্ট থাকেন।

এই কাব্যের ব্যতিক্রমী কবিতাগুলি 'ড্রামাটিক মনোলগের' আকারে মেয়েলি ভাষায় লেখা। কলেজ বোর্ডিংয়ে থাকতেই অথবা নববধূটির অনুরাগ সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী তাদের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন। 'কৈফিয়ৎ', 'আঁধারে আলো' কবিতাগুলির বাস্তবতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভোলবার মত নয়। ১৯৩১ সালে কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহের

পর যুগ্মভাবে সম্পাদিত 'কাব্য দীপালির' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৯২৭ সালে নরেন্দ্র দেবের একক সম্পাদনায় সুবিপুল কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থ 'কাব্য দীপালি'র প্রকাশনার কাজে সম্পাদনা ও সংকলনে নরেন্দ্র দেবকে রাধারাণী সক্রিয় সহযোগিতা করেন। বিবাহের প্রথম বার্ষিকীতে (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) ৩৪টি মিলন বিষয়ক সনেট-সংগ্রহ 'সিঁথি-মৌর' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি রাধারাণী 'কবিভগিনী স্বর্গীয়া এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ'-কে উৎসর্গ করেন। বাংলা সনেটের ইতিহাসে রাধারাণীর সনেট প্রতিভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই 'সিঁথি-মৌর'। এই কাব্যে সেক্সপীয়র ও পেত্রাক্রিয় দুই রীতর সনেটই লেখা হয়েছিল। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ অভিজ্ঞতার চমৎকার নিদর্শন এই 'সিঁথি-মৌর'। ১৯৩৪ সালে দশটি কবিতার সংগ্রহ 'আঙিনার ফুল' অপরাজিতা দেবী নামে প্রকাশিত হয়। এখানেও নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা হয়েছে। শব্দ ব্যবহার, বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য ও নারীর ব্যক্তিগত চিন্তাধারার প্রতীক এই কবিতাগুলি। লিরিকাল মুহূর্তগুলি নাটকীয় ঘনঘটায় সমৃদ্ধ। শুধু কবিতাই নয় এই কাব্যগ্রন্থটিকে সমসাময়িক সমাজের চলমান রূপরেখাও বলা চলে। ১৯৩৫ সালে ১৮টি কবিতার সংগ্রহ 'পুরবাসিনী' কাব্যগ্রন্থ (অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত) প্রকাশিত হয়। কথপোকথনের ভঙ্গীতে রচিত এই গ্রন্থে বিচিত্র জীবনের কাহিনী অশ্রু হাসিতে মাখামাখি হয়ে আছে। এ যেন নারীর নিজস্ব চোখে দেখা বাঙালী সমাজের চরিত্র চিত্রণ। সংসারে নারী-পুরুষের ভুমিকা ও

পারস্পরিক সম্পর্ক এই কবিতায় ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চিরন্তন বাঙালী দিদির মনোবেদনা এই কাব্যের 'দিদি' কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। ১৯৩৭ নরেন্দ্র দেবের যুগ্ম সম্পাদনায় দেব সাহিত্য কুটির থেকে ছোটদের পূজা বার্ষিকী 'সোনার কাঠি' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সেই অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত চতুর্থ ও শেষ কবিতার সংকলন 'বিচিত্ররূপিনী' প্রকাশিত হয়। এতে মোট ১৩টি কবিতা ছিল। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র উজ্জ্বল নীলমণিকে অনুসরণ করে নায়িকার ৮টি রূপ বা লক্ষণকে বর্তমান সময়ের মতন করে সাজিয়ে উপস্থাপিত করেছেন কবি। 'পূর্বরাগ' থেকে 'অভিসারিকা' বা কলহান্তরিতা সমসাময়িক পরিবেশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ১৯৩৮ সালে 'বনবিহগী' কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের চিত্রাঙ্কন করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু এবং গ্রন্থের প্রুফ দেখেছিলেন রাজশেখর বসু। ১৯৪ ৬এ 'কথাশিল্প' নামে একটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। এটি মূলতঃ নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে সহ-সম্পাদনা এবং এতে মোট চোদ্দজন লেখক-লেখিকার গল্প ছিল। প্রকাশক ছিলেন এম. সি. সরকার।

স্বতন্ত্রভাবে রাধারাণী কোন উপন্যাস রচনা করনেনি। কেবল ১৯৩৫ এ কাত্যায়নী বুকস্টল থেকে প্রকাশিত ৮ জন লেখকের লেখা 'অষ্টমী' নামাঙ্কিত উপন্যাসটির একটি অধ্যায় তিনি লেখেন। অনুরূপভাবে কালিদাস রায়

সম্পাদিত 'রসচক্র: বারোয়ারী উপন্যাস'এর (১৯৩৬) নবম পরিচ্ছেদ রাধারাণীর লেখা। ১৯৩৯এ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' প্রকাশিত হয়। এই অসমাপ্ত উপন্যাসখানি সমাপ্ত করবার ভার শরৎ-সাহিত্যের খ্যাতনামা প্রকাশকগণ রাধারাণী দেবীর উপরই দিয়েছিলেন। এই অতি দুরুহ কাজটি তিনি এমন ক্ষমতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেন যে অনেকেই বিস্ময়বোধ করেছিলেন। বইখানি পড়ে বোঝা যায় না যে কোনখানে শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে রাধারাণীর লেখার সংযোগ ঘটেছে। এর ১৬ থেকে ২৬ অধ্যায় রাধারাণী দেবীর রচনা। কিন্তু এমন কৃতিত্বের সঙ্গে এর সৃষ্টি কর্মটি সম্পাদনা করা হয়েছে যে পূর্বে বলে না দিলে এটি যে দুই লেখকের দু সময়ের রচনা তা কখনই পাঠকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ১৯৪৪ সালে 'মিলনের মন্ত্রমালা' প্রকাশিত হয়। বেদ সংহিতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি থেকে হিন্দু বিবাহের মন্ত্রগুলোকে অনুবাদ করে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এটি কেবল অনুবাদই নয় ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। এখানেও ভাবনার এবং রচনাশৈলীতে কবির দক্ষতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত।

১৯৫৩তে ইউ. এন. ধর থেকে প্রকাশিত 'নীতি ও গল্প' ও ১৯৫৫তে একুশটি কিশোরপাঠ্য গল্প-কাহিনীর সংকলন 'গল্পের আলপনা' প্রকাশিত হয় (মহালয়া ১৩৬২)। ১৯৭১এ 'সাহিত্যতীর্থ' পত্রিকায় একগুচ্ছ বিরহ-বিষয়ক

সনেট প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত বিরহ অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ বলে এটি বই হয়ে কখনও প্রকাশিত হয়নি। ১৯৭৬এ আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় 'শরৎচন্দ্রঃ মানুষ এবং শিল্প'। এটি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ। এটি আসলে শরৎচন্দ্রের শতবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত 'শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতা মালা'। ১৯৮৩ সালে তার ৮০ বছরের জন্মোৎসবে 'তাঁকে লিখিত থলে থেকে সামান্য এক গোছা তুলে নিয়ে' 'টুকরো চিঠি' নামে প্রকাশিত হয় (৩০শে নভেম্বর ১৯৮৩, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৯০)।

রাধারাণী দেবীর সমগ্র সাহিত্য-জীবন পর্যবেক্ষণ করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবন কখনই একমুখী নয়। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বিভিন্ন দিকে তাঁর প্রতিভা পরিস্ফুট হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যথা ভারতবর্ষ, প্রবাসী, উত্তরা, মানসী ও মর্ম্মবাণী, বিচিত্রা, মাসিক বসুমতী, জয়শ্রী, প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হলেও তৎকালীন বহু আলোচিত 'শবিনারের চিঠি' পত্রিকায় সর্বদাই তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কবিতনয়া সুকবি নবনীতাকে স্মরণ করা যেতে পারেঃ

'রাধারাণী দত্ত নামে দুঃসাহসী তরুণীটির সাহিত্যজীবন সরল

হয়নি, 'শনিবারের চিঠি'র অনেক আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে

তাঁকে। তাঁর গল্প থেকে, 'মণি-মুক্তা' অংশে উদ্ধৃত করবার মতো আপত্তিজনক অংশ খুঁজে পেতেন সম্পাদক, যদিও বালবিধবা মেয়েটির লেখা গল্পগুলিতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সর্বদাই প্লেটনিক। এমনকি প্রবন্ধেও বিদ্রূপের রসদ তাঁরা খুঁজে পেতেন। 'অন্তঃপুরের রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের জন্য 'শনিবারের চিঠি' কার্টুন বের করেছিল — রাধারাণী বসে কুটনো কুটছেন, ইজিচেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা কবি। কিন্তু মানুষের দেহজ রিপুতাড়না ও আত্মিক প্রেমভাবকে রাধারাণী পৃথক করে দেখেছেন, দেহ ও মনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন জীবনযাপনে, রিপু জয় করাকেই মনুষ্যোচিত কাজ বলে সম্মান দিয়েছেন। প্রেমে দেহের জিৎ তাঁর চোখে মনুষ্যত্বের পরাজয়।"[৩]

এ সমালোচনা কেবল সাহিত্যিক সমালোচনা নয়। অনেকসময়ই তা ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে গিয়েছে। তাঁর গল্প থেকে 'মণিমুক্তা' অংশ উদ্ধৃত করার মত আপত্তিমূলক অংশ খুঁজে পেতেন সম্পাদক। যদিও রাধারাণী দত্ত নামক বালবিধবা মেয়েটির লেখা গল্প ও প্রবন্ধ সর্বদাই প্লেটনিক ও যুক্তিগ্রাহ্য। তথাপি, এমনকি প্রবন্ধেও, বিদ্রূপের অংশ তাঁরা খুঁজে পেতেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা মানুষের দেহজ কামনা ও আত্মিক প্রেমভাবকে রাধারাণী সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখেছেন। তাঁর নায়িকারা প্রেমে পড়ে বটে কিন্তু তারা সনাতন সংজ্ঞায় সতী।

অনায়াসে দেহকে উত্তীর্ণ করে যেতে পারে তাদের প্রেম। বহু গল্পে দেখতে পাই, বালবিধবা, কুমারী ও বিবাহিতা নারীর একাকীত্ব ও অসহায়তার কথা। তারা সাহস করে প্রতিবাদ করে না। সামাজিক নিয়ম কানুন ভাঙ্গে না। আত্মিক বলে ঋজু থাকে। এইসঙ্গেই উল্লেখ্য 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অসহযোগিতাও রাধারাণী বহন করেছিলেন। বিশেষ করে নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে এবং পরে অনেক ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। তাই 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে' পাঠিত প্রবন্ধ 'সাহিত্য বিচারে পুরুষ নারী ভেদ' (১৩৩৭) এখনও সমান জরুরী। বাংলা সাহিত্যের সমালোচকদের চোখে আজও পর্যন্ত নারী ও পুরুষ সমান গুরুত্ব পান না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখাগুলি বহু প্রশংসিত হয়েছিল, খ্যাতিও পেয়েছিল। বিশেষকরে অপরাজিতা দেবী নামে লেখাগুলিতে তিনি পুরুষ লেখকদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং সেই চ্যালেঞ্জে তিনি সার্থক হয়েছিলেন।

(গ) পুরস্কার ও সম্মান লাভ

বাংলা সাহিত্যে মৌলিক অবদানের জন্য ১৯৫০ সালে রাধারাণী দেবী 'ভুবন মোহিনী' পুরস্কার পান।

১৯৫০এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'লীলাপুরস্কার' প্রদান করে তাঁর সাহিত্য সাধনাকে সম্মানিত করেন।

১৯৮৬ সালে 'অপরাজিতা রচনাবলীর' জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা কবি আনন্দ বাগচীর একটি রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে পারি:

'পঞ্চাশ বছরের বাংলা-সাহিত্যের পলিমাটির তলা থেকে অপরাজিতা দেবীর কাব্যচতুষ্টয়কে উদ্ধার করে যাঁরা পুনর্জীবিত করার প্রয়াস পেলেন এবং যে নির্বাচক মণ্ডলী সে রচনাবলীকে দর্শনমাত্রেই রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করলেন তাঁরা উভয়েই যে সেই সশ্রদ্ধ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। এক দেহে ভিন্ন আত্মা অপরাজিতা দেবী নিজের অজ্ঞাতসারেই একদিন কবি রাধারাণী দেবীর যে অপরিসীম ক্ষতিসাধন করেছিলেন, এবারে রবীন্দ্র পুরস্কারে তারই পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ লক্ষ্য করা গেল। বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে পুরুষতান্ত্রিক বাংলা সাহিত্যে এক সমান্তরাল, সচল ও রমণীয় ব্যক্তিত্ব রাধারাণী দেবীর এই পুরস্কার এক অর্থে সমগ্র নারী সমাজেরই পুরস্কার। অন্যথাক অশীতিপর সাহিত্যচেতন অথচ নিরাসক্ত এই মহিলার জীবনে এই ঘটনা কোন নতুন মাত্রা যোজনা করল এমন মনে হয় না। বহু খ্যাতি তিনি ইতিপূর্বে পেয়েছেন। পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা পুরস্কার' ও 'ভূবনমোহিনী পদক'।"[১৪]

১৯৭৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালায় ভাষণ প্রদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করেন।

'রবীন্দ্র-শরৎ যুগের সঙ্গে কল্লোল পরবর্তী যুগের এবং পি.ই.এন সূত্রে আন্তর্জাতিক লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যের সংযোগ সাধনে তিনি সক্রিয় ছিলেন।'[১৫]

(ঘ) অপরাজিতা দেবী

সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত কবিকন্যা নবনীতা দেবসেন লিখছেন:

'রাধারাণী ও অপরাজিতা পৃথকভাবে সংকলিত হলেন। কেননা কবি স্বয়ং দুটি ব্যক্তিত্বকে সযত্নে আলাদা করে রেখেছিলেন শুধু কাব্যলক্ষণেই নয়, হস্তাক্ষরে পর্যন্ত। সেই হস্তলিপি এতই আলাদা, যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে অপরাজিতাকে উৎসাহ দিয়ে একের-পর-এক পত্র লিখেছেন রাধারাণীর ঠিকানায়।'[১৬]

রাধারাণী দত্ত বা রাধারাণী দেবী যখন সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত নাম তখন অপরাজিতা দেবীর আবির্ভাব ঘটে। কবি হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসিত ও আলোচিত হন। এই অপরাজিতা দেবীর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে একটা বিশেষ ঘটনা।

আশ্চর্যের ব্যাপার অপরাজিতা দেবীর পরিচয় নিয়ে সেসময়ে সাহিত্য জগতে তীব্র বিতর্ক বিবাদ ঘটে। কেউ কেউ এঁকে শরৎচন্দ্রের ছদ্মনামে লেখা বলে মনে করতেন। অনেকে অ-প-রা-জি-তা অর্থে পাঁচজন লেখকের ছদ্মনাম বলেও মনে করতেন।

এমনকি যোগেন্দ্র চন্দ্রগুপ্তের লেখা 'বঙ্গের মহিলা কবি'[১৭] গ্রন্থেও রাধারাণী দেবী ও অপরাজিতা দেবী দুটি পৃথক কবি বলে লেখা হয়েছে।

পরবর্তী কালে রাধারাণী দেবী এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। দীর্ঘ ১২ বছর অপরাজিতা দেবী নামে লেখার পর তিনি অপরাজিতা নামে লেখার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নেপথ্য কাহিনীটি রহস্য গল্পের মতই। অতঃপর একটি উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি:

> *'বোধ হয় এর বছরও হয়নি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লীলাকমল' বেরিয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর চায়ের মজলিশে মহিলাদের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী একটি কঠোর মন্তব্য করেছিলেন 'মেয়েদের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই, তারা শুধু পুরুষদের অনুকরণে লেখে...' কথাটা রাধারাণী দেবীকে গভীরভাবে বিদ্ধ করে। এই কথাটিকেই তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে*

গ্রহণ করে দীর্ঘ বারো বছরের জন্য 'অপরাজিতা' নাম্নী এক কাল্পনিক চরিত্রের জনান্তিকে চলে গেলেন। শুরু হয়ে গেল রাধারাণীর নতুন একস্‌পেরিমেন্ট — নারীর চোখে দেখা অন্তরঙ্গ সংসারচিত্র নারীর বরানে। দৃষ্টিকোণ বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় কল্পনা, আঙ্গিক এবং কৌতুককটাক্ষ-কন্টকিত ভাষা ও ছন্দের নতুন চাল বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্বাদের চমক এনে দিল। কাল্পনিক অপরাজিতা চরিত্রের নিপুণ অভিনয় ভালোই জমেছিল সেদিন। সাময়িক সাহিত্য ইতিহাসের সেই আলোড়িত পৃষ্ঠার জীবন্ত নায়িকা অপরাজিতা দেবী আধুনিককালে চোখে বিস্মৃতা এবং প্রয়াতা হলেও তিরিশের দশকের গোড়ায় এবং সেই দশকব্যাপী তিনি ছিলেন বহু-নিন্দিত, অভিনন্দিত এবং অনুকৃত এক নতুন রীতির পথিকৃৎ। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ছদ্মবেশী নারী বিদ্রোহের সূচনা এদেশে ফেমিনিস্ট আন্দোলনের মুখবন্ধ তিনিই রচনা করে গিয়েছিলেন সেই পঞ্চাশ বছর আগে।' [১৮]

ঘরোয়া কথাবার্তা, সাদামাটা শব্দ চয়ন তাছাড়া পয়ারের মাপ মেপে নিয়েও ছড়ায় ছন্দের ঝিলিক। আমাদের সংসারের দৈনন্দিনতার মধ্যে যে হাসিকান্নার কৌতুকের ফুলঝুরি সেই ফুলঝুরিকে কাব্যে সাজানো। যে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তদের ঘরোয়া সমস্যা ও বিষয় নিয়ে অপরাজিতা দেবীর কবিতাগুলি

লেখা হয়েছিল সে রকম অনেক পরিবারের ছেলেমেয়েরা তখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসে দীক্ষা নিয়েছে। স্বাধীনতা ও নতুন সমাজের স্বপ্ন তাদের চোখে। আইন-অমান্য, অসহযোগ ও ভারতছাড়ো আন্দলোনের উতরোল ঢেউয়ে রাজবন্দীদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। অপরাজিতা দেবীর কাব্যে বাইরের এই উথাল পাতাল ঝড় বাদলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নেই। তবু তিরিশের দশকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের বাঙ্গালী অন্দরের চিত্র এই কবিতাগুলিতে পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত। সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসের সে আলোড়িত দিনগুলির নেপথ্যচারিণী অপরাজিতা দেবী আধুনিক কালের চোখে বিস্মৃতা ও প্রয়াতা হলেও তিরিশের দশকে শুরুতে ও সেই দশক ব্যাপী তিনি ছিলেন বহু নিন্দিত ও বহু আলোচিত ও বহু অভিনন্দিত ও অননুকৃত এক ব্যতিক্রমী পথিকৃত। বলা যায় বঙ্গভূমির সাহিত্যজগতে এ যুগের নতুন নারীবাদী আন্দোলনের মুখবন্ধ বা ভূমিকা তিনিই রচনা করেছিলেন।

এ কথাও বলা প্রয়োজন যে সাহিত্যের এই চরিত্র বদল কোন আকস্মিক বা সাময়িক ঘটনা নয়। রাধারাণী দেবীর সমগ্র জীবন ও স্বভাবের মধ্যেই এই দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব ছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিধবা হওয়া একটি বালিকা তার দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে রাজি হয়নি। সে ভাগ্য পরীক্ষায় বদ্ধপরিকর। পরিবারের সচেতন সম্ভ্রম ও মমতার আড়ালে প্রবাহিত করুণা ও কৃপার মধ্যে

নিহিত অপমান তাকে স্পর্শকরে ফেলে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, উপার্জন ক্ষমতা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিছুই তাঁর ছিল না। তাঁর হাতে ছিল কেবল একটি ঈশ্বর দত্ত চাবি। প্রতিভা, যুক্তি ও জেদ, যা দিয়ে তিনি বর্হিবিশ্বে দাঁড়ানোর সাহস সংগ্রহ করেছিলেন। তাই স্বনামে গভীর লিরিক কবিতা লিখছিলেন। সেই বিচিত্র হৃদয়-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার উপলব্ধিকে জীবনের রসে জারিত করে রক্ষণশীল সমাজের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করার সাহস অর্জন করেছিলেন। কবি নরেন্দ্র দেবকে বিবাহ করে তাঁর দুঃসাহসী সততা ও প্রেমের একনিষ্ঠ মূল্যবোধকে প্রমাণিত করেছিলেন নতুন করে। অপরাজিতা নামের আড়ালে তাঁর আকস্মিক আত্মগোপন ও সেই অজ্ঞাতবাসকে একটানা বার বছর চালিয়ে যাওয়া নেহাতই একটা চ্যালেঞ্জের ফসল এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। এর পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাধারাণী দেবীর স্বগৃহে আহূত এক প্রীতি সভায় অভিনন্দনের উত্তরে লেখিকা বলেছেন "সাহিত্যে ঠিক দেখতে পাওয়া, বলতে পারা আর ঠিক জায়গায় থামা -- তিনটি জিনিষই সমান কঠিন।"

কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কলমের ও জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়ার পর সংবরণের চেষ্টা যে কোন সফল ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিকের একটি বড় গুণ। নতুন সাহিত্য জীবন, তথা সুখী দাম্পত্য জীবন তাঁকে এতই আবিষ্ট ও সুখী করেছিল যে তিনি স্বেচ্ছায় অন্তরীণ হয়েছিলেন। আমরা পুনধার স্মরণ

করি কবিকন্যা অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেনকে:

'আমার মা রাধারাণী দেবীকে আমি দেখেছি সাম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে। যশস্বী প্রিয়মান স্বামী, ও অনুগত সন্তান-সমেত সুচারু একটি সংসার জীবনে সম্পূর্ণ, আপন মননশীলতার গুণে সুধীমণ্ডলে সম্মানিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রতিটি কথার মূল্য আছে, যাঁর পদ-চয়নে আত্মবিশ্বাস ঝলসে ওঠে।'[১৯]

অপরাজিতা দেবীর চারটি কবিতার বই 'বুকের বীণা'(১৩৩৭), 'আঙিনার ফুল'(১৩৪০), 'পুরবাসিনী'(১৩৪২) এবং 'বিচিত্ররূপিণী'(১৩৪৩), তিপ্পান্নটি কবিতায় যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবমুখীনতা, তার প্রধান বিষয় হল নারীর পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সংসারজীবন। বলতে গেলে নারীর চোখে দেখা নারীর জীবন। সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকায় নারী নিজেকে ও পুরুষকে দেখতে গিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সংস্কার ও মূল্যবোধগুলিকে পরিস্কার করে দেখতে পেয়েছে।

অসংখ্য চরিত্রের মুখচ্ছবি ও সামাজিক রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে তিনি ব্যবহার করেছেন মুখের ভাষাকে যার নাম 'কলোকয়াল'। ড্রামাটিক মানোলগ বা নাটকীয় সংলাপের সঙ্গে তাৎক্ষণিকতাকে যুক্ত করে একদিকে লিরিক মুহূর্তের নাট্যধর্মী 'ডিটাচমেন্ট' ভেঙেছেন অন্যদিকে অ্যান্টি রোমান্টিক অভিঘাত দিয়ে

কবি কল্পনাকে বাস্তবভূমিতে দাঁড় করিয়েছেন। অপরাজিতার কবিতা প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ দ্রুত নিঃশেষিত সংস্করণ ও তৎকালীন নানা সাহিত্যের আড্ডায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে যুগের কিছু রক্ষণশীল মানুষ কবিতাগুলির মধ্যে শালীনতার অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। আনন্দ বাগচী এ বিষয়ে লিখছেন:

'শরৎচন্দ্র অপরাজিতার কবিতাকে অশ্লীল বলেছিলেন। সে যুগের বেশ কিছু রক্ষণশীল মানুষ কবিতাগুলির মধ্যে স্ত্রীসুলভ শালীনতার অভাব লক্ষ্য করলেও রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর পরিমুখ সাহিত্যরসিক কিন্তু অভিনন্দনই জানিয়েছিলেন সেদিন। এই ধরণের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'সোসাইটি ভার্সেস' আখ্যা দিয়ে একটা কথা অকপটে অপরাজিতাকে জানিয়েছিলেন, 'এদের নৈপূণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প।' রাধারাণীও জানতেন সে কথা। তাই আয়ু ক্ষয় হবার অনেক আগেই তিনি সাহিত্যের বাজার থেকে অপরাজিতার খাতা তুলে নিয়েছিলেন নির্মম হাতে। কিন্তু কবিতা হিসেবে এই কাব্যগ্রন্থগুলির স্থায়িত্ব যাই হোক এর অন্য মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই।'[২০]

কিন্তু সমকালীন সাহিত্যিকরা একে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে এর সঙ্গে

তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অপরাজিতা জানতেন সে কথা। তাই 'বিচিত্ররূপিনীর' সংস্করণ নতুন করে হবার আগেই তিনি সাহিত্যের বাজার থেকে 'অপরাজিতার খাতা' তুলে নিয়েছিলেন নির্মম হাতে। কিন্তু কবিতা হিসেবে এর মূল্য যতই কম হোক না কেন ব্যঞ্জনা বা গভীরতা না থাকলেও এর অন্য মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কবিতাগুলি পঞ্চাশ ষাট বছর আগের ঘরোয়া ছবিই শুধু নয়, জীবন যাপনের তথ্য হিসেবে এর গুরুত্ব কম নয়। যার ঐতিহাসিক মূল্য কোনদিনই ম্লান হবে না। সামাজিক বিবর্তনের অনেক ইঙ্গিত, হারিয়ে যাওয়া অনেক সম্পর্ক ও বিস্মৃত প্রায় বহু উদাহরণ এর মধ্যেই বিদ্যমান। আর ছন্দের ক্ষিপ্র অথচ নমনীয় গতিশীলতাও নজর এড়িয়ে যায় না। যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারেও কবির নৈপুণ্য অসাধারণ। মেয়েদের নিজস্ব সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার প্রথম এবং এখন পর্যন্ত পথিকৃৎ হিসেবে অপরাজিতার কবিতা আজও অভিনন্দিত হবে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে অপরাজিতার কবিতাই রবীন্দ্রনাথকে দুটি দীর্ঘ কৌতুক কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেছিল। আর পত্র সাহিত্যের ভাণ্ডারেও দুখানি অন্তরঙ্গ চিঠি আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারের মর্যাদা বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। এ কৃতিত্বও অপরাজিতারই প্রাপ্য।

অতঃপর অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা

এই পর্ব শেষ করব। উদ্ধৃতিটি আয়তনে তুলনায় দীর্ঘ হলেও — এ বিষয়ে পাঠকের বহুবিধ কৌতূহল নিরসনে একান্তই সহায়ক:

'১৩৪১ সালের মাঘ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'নারী-প্রগতি ' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তার উত্তরে অপরাজিতা দেবী কবিকে তাঁরই ব্যবহৃত ছন্দে একটি উত্তর লিখে পাঠান। 'প্রহাসিনী'র 'আধুনিকা' কবিতাটি তারই প্রত্যুত্তরে রচিত। অপরাজিতা দেবীর উক্ত 'সে-কালিনী ও আধুনিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর 'আধুনিকা' নামে ১৩৪১ সালের চৈত্রমাসের প্রবাসীতে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিগুরুর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও অপরাজিতা দেবী আত্মপ্রকাশ করেননি। এই উত্তর-প্রত্যুত্তর বছর তিনেক পরে লেখা কবির চিঠি (৩০/৩/৩৭) থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অপরাজিতা দেবীর এই রহস্যময় অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে রাধারাণী দেবী, 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থের লেখককে যে পত্রখানি লেখেন তা অপরাজিতা রহস্য-উন্মোচনের সহায়ক।

রাধারাণী দেবী বলেছেনে, 'অপরাজিতার ছদ্মনামে নতুন গঠনের কবিতায় হাত দিয়েছি যখন, মনে তখন দুরন্ত আবেগ। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলাম, দ্বাদশ বর্ষ নিজেকে সম্পূর্ণ

আড়ালে রেখে ছদ্মনামে ও ছদ্ম-পরিচয়ে এই পরীক্ষা করব, রচনা তার শক্তি ও উৎকর্ষের দ্বারা যথার্থ মূল্য পেতে পারে কিনা। এই আত্মপরীক্ষায় আমাকে বহু কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বহু দুঃখ সইতে হয়েছে।'

রাধারাণী দেবীর সবচেয়ে অগ্নিপরীক্ষার দিন এল যখন রবীন্দ্রনাথকে জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলে এলেন যে, অপরাজিতা মেয়ে নয়, পুরুষ। ক্রুদ্ধ কবি রাধারাণী দেবীকে ডেকে পাঠালেন। সেদিনও রাধারাণী দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে কবিকে বললেন, 'অপরাজিতা আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। এখন আত্মপ্রকাশ করার উপায় নেই তার। তবে অপরাজিতা তার আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হলেই সে আপনার সামনে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে আপনাকে প্রণাম করে ধন্য হবে।'

রাধারাণী দেবীর এই আত্মগোপন-ক্ষমতা অসামান্য। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহের পূর্ব থেকেই তিনি অপরাজিতা নামে কবিতা লিখতেন। হাতের লেখাও একেবারে আলাদা করে ফেলেছিলেন। অপরাজিতার প্রথম গ্রন্থ 'বুকের বীণা' বিবাহের আগেই প্রকাশিত হয়। বিবাহের পরেও কিছুদিন নরেন্দ্র দেব

জানতে পারেননি, তার স্ত্রী-ই অপরাজিতা দেবী। একদিন মধ্যরাতে পড়ার ঘরে স্ত্রীর সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর টেবিলে দুই ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা কবিতার খসড়া ও তার অনুলিপি দেখে প্রথম বুঝতে পারেন রাধারাণীই অপরাজিতা। বিস্ময়ের বিষয়, নরেন্দ্র দেবও গৃহিণীর এই গোপন কথা কোনোদিন কাউকে প্রকাশ করেননি।"[২১]

গ্রন্থপঞ্জী: প্রথম অধ্যায়

১. রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১ — রাধারাণী দেবী (প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৯৯)
২. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — রাধারাণী দেবী (প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪০৮)
৩. লীলাকমল — রাধারাণী দেবী — ১৩৩৬
৪. বুকের বীণা — অপরাজিতা দেবী — ১৩৩৭
৫. কাব্যদীপালি — সম্পাদক: নরেন্দ্র দেব — ১৯২৭
৬. সিঁথি মৌর — রাধারাণী দেবী — ১৩৩৯
৭. আঙিনার ফুল — অপরাজিতা দেবী — ১৩৪০
৮. পুরবাসিনী — তদেব — ১৩৪২
৯. বিচিত্ররূপিনী — তদেব — ১৩৪৩
১০. কথাশিল্প — সম্পাদক: নরেন্দ্র দেব — ১৯৪৬
১১. বনবিহগী — রাধারাণী দেবী — ১৩৩৯
১২. শরৎচন্দ্র: মানুষ এবং শিল্প — তদেব — ১৯৭৬
১৩. পুরোনো বাংলা গদ্য — আনিসুজ্জামান (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
১৪. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যপাঠ — ড. নির্মল দাশ
১৫. বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১.	রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১ (রাধারাণী দত্ত ও রাধারাণী দেবী এবং আমরা — নবনীতা দেবসেন)	১২-১৩
২.	তদেব	১৩
৪.	তদেব	১৮-১৯
৫.	তদেব	১৮
৬.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা: ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য	৭
৭.	রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১ : নবনীতা দেবসেন	২০
৮.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা: ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য	৮
৯.	রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১ (পুজোর স্মৃতি)	২৮৯
১০.	রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১ : নবনীতা দেবসেন	৫-৬
১১.	তদেব	৭, ১০, ২০
১২.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা: ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য	৮-৯
১৩.	রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১ : নবনীতা দেবসেন	১
১৪.	সাহিত্যের নানারকম — আনন্দ বাগচী	৫২
১৫.	তদেব	৫২
১৬.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা: প্রাক্‌কথন: নবনীতা দেবসেন	৬
১৭.	বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৪৯-৩৬৪
১৮.	সাহিত্যের নানাকরম — আনন্দ বাগচী	৩৬৪-৩৭৪
১৯.	রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১ : নবনীতা দেবসেন	৫২-৫৩
২০.	সাহিত্যের নানারকম — আনন্দ বাগচী	৫৫-৫৬
২১.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য	১৭